Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গনতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুল্লাহ আল মামুন

রোলঃ 216011012

২৭ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গনতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আব্দুল্লাহ আল মামুন

রোলঃ 216011012

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গনতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আব্দুল্লাহ আল মামুন, আইডিঃ 216011012 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গনতন্ত্রের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আব্দুল্লাহ আল মামুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৭ মে, ২০২৪ ইং

আব্দুল্লাহ আল মামুন

আইডিঃ 216011012

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন অন্য দ্বীন অন্বেষণ করতে। সুতরাং কোন মুমিনের সুযোগ নেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার। সুযোগ নেই এ দ্বীনের মধ্যে কিছু সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার।

বড়ই আফসোসের বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর মুসলিমের মধ্যে ইসলামে সংযোজন-বিয়োজনের প্রবণতা।আধুনিক কালের পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসী জোয়ারকে যৌক্তিক ভাবে মোকাবিলায় অক্ষম এক শ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ এক সময় সমাজতন্ত্র নামক বিজাতীয় মতাদর্শকে কিছুটা সংস্কার করে ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করার চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। বর্তমানেও ঐ মানসিকতার ইসলামী চিন্তাবিদগণ মানব রচিত গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে আত্মীকরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের জয়-জয়কার চলাকালে তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছিলেন, শুধু নাস্তিক্যবাদী চিন্তাটাকে বাদ দিলে সমাজতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। সমাজতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত প্রমাণের জন্য তাঁরা 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষা চালু করেন।

বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে প্রভাব বিস্তার করে থাকা বিজাতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মতবাদ 'গণতন্ত্র' সম্পর্কেও একশ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ অনুরূপ ভাষ্য প্রদান করে গণতন্ত্রকে

মুসলিম বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা বলছেন, শুধু সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গটি বাদ দিলে গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। 'মাসিক পৃথিবী' নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় বলা হয়েছে 'ইসলাম ও গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেটি বাদ দিলে গণতন্ত্রের বড় বড় ৪টি পয়েন্টের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই'।

গণতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত ও মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা 'ইসলামী গণতন্ত্র' পরিভাষা চালু করেছেন। অথচ গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, ইতিহাস, এর মূলনীতি ও আদর্শগুলোকে ইসলামী শরী'আতের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, গণতন্ত্র একটি মানব রচিত শিরকী, কুফরী, জাহেলী মতবাদ। যা কখনো ইসলামের সাথে এক হবার নয়।

মানব রচিত এই মতবাদের কিছু বিষয়কে ইসলামাইজড় করে গ্রহণ করা হ'লে, তা হবে দ্বীনের বিকৃতি সাধন বা গায়ের ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার শামিল, যা আল্লাহ তা'আলা কখনো গ্রহণ করবেন না *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*।

গণতন্ত্রের পরিচয়

গণতন্ত্র বলতে কোনও জাতিরাষ্ট্রের (অথবা কোনোও সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও তৈরীর ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা

নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে। "গণতন্ত্র" পরিভাষাটি সাধারণভাবে একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হলেও অন্যান্য সংস্থা বা সংগঠনের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হতে পারে, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক ইউনিয়ন, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

গণতন্ত্র (Democracy) কি?

এটা যেহেতু একটা পরিভাষা (Terminology), যাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়, এজন্য পরিভাষার মূলনীতি হল, এর সেই সংজ্ঞাই ধর্তব্য হবে যা এর প্রণয়নকারীরা বর্ণনা করেছেন।

Democracy এর অর্থ

শব্দটি মূলত গ্রীক । Demos এবং Kratos দু'টি শব্দের সমন্বয়ে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে।

Demos এর অর্থ : People বা জনগণ ।

আর Kratos এর অর্থ Rule বা শাসন ।

অর্থাৎ Rule of the people জনগণের শাসন ।

Democracy: Free and equal representation of people.

A government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly

indirectly through a system of representation usu. involving periodically held free elections.

Democratic System of Government: A system of government based on the principle of majority decision-making. [Encarta *2009;Encyclopaedia Britannica 2012.*

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা:

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪২২ সালে ক্লিয়ান ডেমোক্রেসিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে- That shall be the democratic which shall be the people, for the people. অনেক পরে আব্রাহাম লিঙ্কন তার এক ভাসনের মধ্যে ঠিক এমনই এক জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করেন। আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) November 19, 1863 জতারিখে তার দেয়া Pennsylvania state এর গেটিসবার্গ বক্তৃতাতে (Gettysburg Address) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে 'Government of the people, by the people, for the people.' যার অর্থ হলো-গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য। অধ্যাপক গেটেলের মতে,' যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগে অংশ নেওয়ার অধিকারী তাই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধাঃ

সুবিধাসমূহঃ

১. সহিংসতা ছাড়া ক্ষমতার পরিবর্তন।

২. সংখ্যাগরিষ্ট জনগনের আশা আকাংখার প্রতিফলন।

৩. সরকার জনগণের মন রক্ষা ও বিরোধীদলের সমালোচনার জন্য সর্বাত্মক উন্নয়ন করে।

৪. জনগণ মত প্রকাশের সুযোগ পায়।

অসুবিধাসমূহঃ

১. দেশের সকল মানুষ সচেতন না থাকলে ভুল মানুষ নেতা হয়।

২. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়না।

৩. নির্বাচনে কারচুপি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা হয়না।

৫. বিরোধীদলের বিরোধিতার কারণে কাজ বাস্তবায়নে প্রচুর সময় ব্যয় হয়।

৬. ভোটাধিকার নির্ধারণের মাপকাঠি বয়স হলে অনেক সময় মূর্খরা অপাত্রে ভোট দেয়।

৭. দলীয় প্রভাবের কারণে খারাপ মানুষ নির্বাচিত হতে পারে।

ইসলাম কি বলে?

যারা গনতন্ত্র হারাম বলেছেন তারা বলেন তারা নিচের আয়াত পেশ করেন-

আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে (সুরা আন-আম: ১১৬)

আর যারা গণতন্ত্র(শর্তসাপেক্ষে) হালাল বলেছেন তারা বলেন-

যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে” -(সুরা:আস-শুরা ৩৮)

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা’আলার উপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন। (সুরা:আল-ইমরান:১৫৯)

“পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে”, “কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন” এখানের কাজে কি নেতা নির্বাচন আসেনা?

এখানে যে ৩টি আয়াত দেয়া হয়েছে সেগুলো দেখলে বুঝা যায়-

১ম. আল্লাহ সকলের পরামর্শ(মত/ভোট) নিতে নিষেধ করেছেন।

২য়. যারা আল্লাহর আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে অর্থাৎ মুমিন তারা ভোট/মত দিতে(পরামর্শ করতে) পারবে।

৩য়. নবীজি আল্লাহর বানী পাওয়া সত্তেও মুমিনদের সাথে পরামর্শ করেছেন/আল্লাহ করতে বলেছেন।

ইসলামী গণতন্ত্র

অনেকে ইসলামী গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহারের বিরোধিতা করে বলেন, ইসলাম শুধুই ইসলাম। এর সাথে আর কিছুই নেই। আমি এ বিষয়ে একমত। ইসলামে যাবতীয় সমস্যার উত্তম সমাধান রয়েছে আর সকল সমাধান মিলেই ইসলাম। ইসলামী গণতন্ত্র শব্দটি কেন ব্যবহার করা হয়েছে বা কেন বলা যাবে তা ব্যাখ্যা করছি। মূলত সাধারণ/ আধুনিক/ পশ্চিমা গণতন্ত্র আর ইসলামের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। তাই বলে ইসলামে গণতন্ত্রের চর্চা নেই তা নয়। সাধারণ গণতন্ত্রের সুবিধা-অসুবিধা আছে কিন্তু ইসলাম যে গণতন্ত্রের শিক্ষা দেয় তার অসুবিধা নেই বললেই চলে।ইসলামের ক্ষেত্র ব্যাপক, তেমনি গণতন্ত্রেরও রয়েছে অনেক রুপ:যেমন

এটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত ।

এটি এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা যাতে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মহান আল্লাহর পরিবর্তে সাধারণ জনগণের হাতে ন্যস্ত হয় (নাউযুবিল্লাহ) এবং সর্বসাধারণের রায়ের ভিত্তিতে সরকার নির্বাচন করা হয় । রায়ের ক্ষেত্রে ইলম ও তাকওয়ার দিক থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রে তা উপেক্ষিত থাকে । এখানে সবাই সমান (অর্থাৎ একজন আলেম ও একজন জাহেল, একজন পাপিষ্ঠ ও একজন নেককার সমান গুরুত্ব বহন করে)। এটি এমন একটি সরকারব্যবস্থা যাতে মানবজ্ঞানই জীবনব্যবস্থা তৈরিকারী এবং মানুষের জন্য জীবনবিধান প্রণয়নকারী, ওহীর এখানে কোনোই দখল নেই । মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি যাকে উপকারী সাব্যস্ত করে, তা উপকারী। আর যাকে ক্ষতিকর বলে, তা ক্ষতিকর। যাকে হারাম (বেআইনী) সাব্যস্ত করে তা হারাম, আর যাকে হালাল (আইনসম্মত) সাব্যস্ত করে, তা হালাল । ওহী (কুরআন ও গদীস) কখনো এই জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির চাওয়ার সাথে মিলে গণতন্ত্রকে যারা ইসলামী বলেন অথবা ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যম বানানোর পক্ষে, তাদের দলিলসমূহ

১. গণতন্ত্রকে অনেকে হুবাহু ইসলাম বলেন । তাদের দলিল হল, ইসলামও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবক্তা। আর গণতন্ত্রও এই কথাই বলা হয়েছে।

সুতরাং গণতন্ত্রই ইসলাম এবং ইসলামই গণতন্ত্র ।

২. তারা বলেন, শরীয়তও শূরা ব্যবস্থার অধীনে খলিফা নির্বাচন করে । আর গণতন্ত্রও এই কথাই বলে । সুতরাং উভয়টি একই জিনিস । ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ।

৩. গণতন্ত্র ব্যবস্থায় জড়িত, যাদেরকে ধার্মিক মনে করা হয়, তাদের আকিদা

হল- তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে শরীয়ত প্রবর্তন করবেন । অর্থাৎ এই . ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করবেন । তাদের আকিদা অনুযায়ী গণতন্ত্র ছাড়া এমন আর কোনো পথ-পন্থা নেই, যার মাধ্যমে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা যেতে পারে । সব পথ- পন্থাই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সুতরাং গণতন্ত্রই একমাত্র পথ, যে পথে সারা বিশ্বে শরীয়ত প্রবর্তন হতে পারে। যাহোক, এই শ্রেণী ও গণতন্ত্রকে কুফর মনে করেন না। তাদের বক্তব্য হল, গণতন্ত্রের যে বিষয়গুলো কুফরি, আমরা সেগুলো মানি না । আমরা কুরআন ও সুন্নাহ সম্মত গণতন্ত্র মানি ।

৪. গণতন্ত্রের সাথে জড়িত কোনো কোনো ধার্মিক ব্যক্তিত্ব এই ব্যবস্থাকে এ পর্যায়ের কুফরি তো মনে করেন কিন্তু তাদের বক্তব্য হল, তারা অপারগ হয়ে এই ব্যবস্থায় জড়িত হয়েছেন । যাতে এর মাধ্যমে মুসলমানদের হক ও অধিকারসমূহ রক্ষা করা যেতে পারে। হিন্দুস্তানের ধর্মীয় রাজনৈতিক লিডারদেরও দাবি এই যে, তারা এই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে

পার্লামেন্টে না গেলে মুসলমানদের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তুলবে কে? মুখ খুলবে কে?

৫. এই ব্যবস্থায় জড়িত একটি শ্রেণী এ কথা বলে যে, দেশের আইন ইসলামী হলে গণতন্ত্র ব্যবস্থায় শরিক হওয়া পাপের কোনো বিষয় নয় । মানে এরাও গণতন্ত্রকে কুফর মনে করেন না ।

গণতন্ত্রকে যারা কুফর বলেন তাদের দলিলসমূহ

পূর্বেই বলেছি যে, গণতন্ত্র বিশেষ একটি পরিবভাষা। সুতরাং এর সে সংজ্ঞাই বিশ্বাসযোগ্য হবে, যা পরিভাষা রূপদানকারীরা করেছেন । কেউ ইচ্ছামাফিক সংজ্ঞা দিলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না । কারণ পরিভাষার সেই অর্থই বিশ্বাসযোগ্য হয়, যার জন্য সেটাকে তৈরি করা হয়েছে।

সুতরাং যখনই গণতন্ত্র শব্দটি বলা হবে, এর সেই অর্থ-মর্মই উদ্দেশ্য হবে, যা এর প্রণয়নকারীরা বর্ণনা করেছেন । আর তা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্টভাবে জেনে রাখা উচিত যে, এখানে আমরা 'ইসলামী গণতন্ত্র' নামক কোনো কাল্পনিক দর্শনের কথা বলছি না, যা গণতন্ত্রের সাথে জড়িত কোনো কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বক্তব্য অনুযায়ী তারা ক্ষমতায় এসে বাস্তবায়ন করবেন । কারণ ৬৫ বছর ধরে এই কাল্পনিক রূপ বইয়ের ভেতর মলাটবদ্ধ রয়েছে । আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও তার রূপ দাঁড়াতে পারেনি । তাই এটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয় । (যদিও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ ঈমান হল গণতন্ত্রকে ইসলামী বানানো তেমনই অসম্ভব, যেমন অসম্ভব মূর্তিঘরকে ইসলামী মূর্তিঘর এবং মদ্যশালাকে ইসলামী মদ্যশালা বানানো।) আমরা এখানে প্রচলিত সেই গণতন্ত্র ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছি, যা ৬৫ বছর ধরে কার্যত বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। যাতে এসব ধর্মীয় দলগুলোও শরিক রয়েছে । নিঃসন্দেহে দেশে আক্ষরিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত এই গণতন্ত্র সেই অর্থেরই ধারক গণতন্ত্র, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি ।

ভোট কি শরীয়ত সম্মত পরামর্শ?

বর্তমানে কোনো কোনো ব্যক্তি এই কুফরি ব্যবস্থাকে ইসলাম প্রমাণের জন্য গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে ইসলাম প্রদত্ত শূরাদর্শনের সমার্থক প্রমাণ করতে চান এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত শোনান—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমনতকে তার প্রাপকের নিকট পৌঁছিয়ে দাও । [সূরা নিসা : ৫৮]

আর ভোটও একটা আমানত । এজন্য এই আমানতও তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও ।

আসুন, নির্বাচন ও শরীয়ত প্রদত্ত পরামর্শের দর্শনের মাঝে কতিপয় মৌলিক পার্থক্য জেনে নিই । এতে আমরা জানতে পারব যে, ভোট সত্যিই কোনো আমানত অথবা পরামর্শ কি না । নাকি এটি একেবারেই ভিন্ন একটা দর্শন ।

১. ইসলামে পরামর্শ নিছকই একটি রায়। এই রায় গ্রহণও করা যেতে পারে প্রত্যাখ্যানও করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে যে ভোট গ্রহণ করা হয়, এতে সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না ।

২. ইসলামে যাদের সাথে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে, তারা এমন ব্যক্তি হবেন, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে পরামর্শ ও রায় প্রদানের যোগ্যতা দান করেছেন । পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ভোট সবার অধিকার । জ্ঞানী-মূর্খ,ব্যাভিচারী-আল্লাহর ওলী, কাফের-মুসলমান সবাই সমান । গণতন্ত্রে এদের সবারমান এক বরাবর ।

৩. শরীয়তের আলোকে মুসলমানদের বিষয়ে কাফের, মুরতাদ ও জিন্দিক পরামর্শ দিতে পারে না । কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় এরা সবাই সামান অধিকার রাখে । মুসলমানদের বিষয়েও এরা পরামর্শ দিতে পারে ।

৪. কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ করা হবে, ইসলামে তা নির্দিষ্ট রয়েছে। যেমন দ্বীনের মৌলিক নীতিমালাগুলোর উপর পরামর্শ করা যায় না। বরং এগুলোর উপর হুবাহু আমল করতে হবে । পক্ষান্তরে নির্বাচনে তো একদিকে ইসলাম বাস্তবায়নের দাবিদার, অন্যদিকে খাঁটি সেকুলারেজমের ধ্বজাধারী দাঁড়ায়। আর জনগণ যদি সেকুলারকে গ্রহণ করে এবং সেকুলারদলকে বেশি ভোট দেয়, তবে 'জনগণের ম্যান্ডেট'কে সম্মান জানানো আবশ্যক হয়ে যায় । (নাউজুবিল্লাহ-আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন । আমীন ।)

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের দৃষ্টান্ত

কতিপয় বখাটে হারাম ও অবৈধ কোনো কাজ করার জন্য একত্রিত হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এবার এই হারাম কাজ কে করবে? এর ফয়সালা জনগণ করবে । যাহোক, জনগণকে বলা হল, আপনারা যাকে এই হারাম কাজের জন্য ভোট দিবেন, এবার সেই করবে । এখন যদি কোনো ব্যক্তি এখানে দাঁড়িয়ে এ কথা বলে যে, ভাই এটা পরামর্শ । আর পরামর্শ আমানত । আপনিই বলুন, হারাম কাজে পরামর্শ দেয়া কি জায়েয আছে? এটাকে কি আপনি আমানত বলবেন?

শরীয়ত ও গণতন্ত্রে চুক্তি এবং সমঝোতা দর্শন

কুফরির দাসত্ব, জিহাদের প্রতি ঘৃণা আর জীবনের প্রতি মায়া- মুসলমানদেরকে এ পরিমাণ হীনমন্য করে দিয়েছে যে উসূল ও ইকদারই (Principles & Values) উল্টে গিয়েছে । লাঞ্ছনাকে সম্মান বলে দেয়া হয়েছে আর পরাধীনতাকে স্বাধীনতা । বর্তমানে গণতান্ত্রিক লোকেরা বিধর্মীদের দাসত্ব এবং তাদের সাথে জোট করাকে সমঝোতা ও চুক্তি বলে থাকে এবং সীরাতের বিভিন্ন ঘটনার সামনে-পেছনে কর্তন করে দলিল দেয় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মদীনার ইহুদীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। বলা বাহুল্য, আসলাফ চুক্তি ও সমঝোতার

গণতন্ত্রের পরিভাষা না বোঝার ভয়ানক ফল

গণতন্ত্রের পরিভাষাগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করার কারণে এই ক্ষতি হচ্ছে যে, ওলমায়ে কেরামের নিকট যখন কোনো মাসআলা বা ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা গণতান্ত্রিক পরিভাষাগুলো সামনে রাখে না, যা এই ব্যবস্থায় প্রচলিত রয়েছে। বরং তারা শরীয়তের পরিভাষা সামনে রেখে ফতওয়া দেন। বিষয়টি বোঝার জন্য এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। যার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে আসবে যে ওলামায়ে কেরাম যে ফতওয়া দেন, সাধারণত এ ক্ষেত্রে তাদের অসাধুতা না থাকলেও পরিভাষার পরিবর্তনের কারণে সাধারণ মানুষ ধোঁকা খাচ্ছে । প্রশ্ন : ওলামায়ে কেরামের নিকট যদি ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা হয় যে নিম্নোক্ত হারাম কাজে সহযোগিতা করা কেমন :

১. পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর কুফরি ব্যবস্থা এবং সুদি কারবার রক্ষায় ভূমিকা পালন করা কেমন?

২. পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর নাইট ক্লাব, মদ্যশালা, পতিতালয় এবং

নাচগানের আসরে নিরাপত্তা দেয়া কেমন ?

বলার অপেক্ষা রাখে না, ওলামায়ে কেরাম উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর এই উত্তরই দিবেন যে, উল্লেখিত কাজগুলো হারাম এবং কবিরা গুনাহ। আর কবিরা গুনাহে সহযোগিতা করা হারাম । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

গুনাহ ও অন্যায়ের (ভিত্তির) উপর পরস্পরে সহযোগিতা করবে

না । [সূরা মায়েদা : ২]

সুতরাং হারাম ও অবৈধ কোনো কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করাও কবিরা গুনাহ । ফতওয়ায় সাধারণত এতটুকুই উত্তর দেয়া হয়, যতটুকু প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে বা প্রশ্নের সাথে যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে। প্রশ্নে যেহেতু শুধু এই কাজগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, সুতরাং এই কাজগুলো কবিরা গুনাহ। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হল-

لا يكفر مسلم بذنب مالم يستحله

কবিরা গুনাহ করার কারণে কোনো মুসলমানকে কাফের বলা হবে না, যতক্ষণ না সে ওই কাজকে (কবিরা গুনাহকে) হালাল ও বৈধ মনে করে।

প্রশ্নকারী প্রশ্নই করেছে অসম্পূর্ণ। এজন্য উত্তরও পেয়েছে অসম্পূর্ণ । বিদ্যমান কুফরি ব্যবস্থা সামনে রেখে পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন এভাবে হওয়া উচিত ছিল:

এমন ‘কালেমাওয়ালা’ ব্যক্তি, যার আকিদা হল বিশেষ একটা শ্রেণীতে প্রবেশ করার পর অথবা বিশেষ একটা চাকরি নেয়ার পর নিম্নোক্ত কাজ তার জন্য শুধু হালালই নয় বরং পবিত্র ফরয (Duty) এর মর্যাদা রাখে । আর এ সব কাজ করতে গিয়ে কখনো মুসলমানের

জীবন নেয়াও কি তার জন্য বৈধ এবং নিজের জীবন উৎসর্গ করা তার দায়িত্ব এবং সৌভাগ্য ও শাহদতের বিষয় হয়? কাজগুলো নিম্নে উল্লেখ

করা হল-

১. সুদি কারবারী এবং সুদি কেন্দ্রের (যেমন ব্যাংক ইত্যাদির) নিরাপত্তা বিধান করা এবং নিরাপত্তা বিধান করাকে নিজের জন্য ফরয জ্ঞান করা? এর হেফাজতের জন্য যে কোনো মুসলমানের জীবন নেয়া কিংবা নিজের জীবন দেয়াকে পবিত্র দায়িত্ব মনে করা?

২. নাইট ক্লাব, মাসাজ সেন্টার, মদ্যশালা, পতিতালয়, নাচগানের কনসার্টের পাহারাদারী করাকে নিজের জন্য আইনসম্মত বা হালাল মনে করা এবং এটাকে নিজের ডিউটি বা ফরয বলা কেমন?

৩. এমন আসর-অনুষ্ঠানের পাহারাদারীকে নিজের জন্য আইনসম্মত (হালাল) মনে করা যেখানে মহান ব্যক্তিত্বদেরকে (হযরত সাহাবায়ে কেরাম) গালি দেয়া হয়, যাদেরকে ভালোবাসা প্রতিটি মুসলমনানের আকিদার অংশ, তা কেমন?

৪. অফিসার বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে শরীয়তের আইন বাস্তবায়নের দাবিদার এবং কুরআন পড়ুয়া মাসুম নিঃস্পাপ-নিরাপরাধ মেয়েদেরকে হত্যা করা, মসজিদে আক্রমণ করাকে নিজের জন্য হালাল ও আইন সম্মত মনে করা, খতমে নবুওয়াতের আকিদার হেফাজত এবং সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার হেফাজতের জন্য পথে নেমে আসা মুসলমানদের উপর গ্যাস নিক্ষেপ, গরম পানি নিক্ষেপ এবং লাঠি চার্জ করাকে নিজেদের জন্য আইন সম্মত বা হালাল মনে করা কেমন? এবং এ কথা বলা যে, আমরা তো আমাদের অফিসারদের নির্দেশ পালন করছি? উত্তর : এইভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় এবং বাস্তবতাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়, তো উত্তরের ভেতরও নিঃসন্দেহে ভিন্নতা আসবে ।

উপরে উল্লেখিত কাজগুলো যে কবিরা গুনাহ, এতে ওই সব সরকারি ও দরবারি আলেমদেরও সন্দেহ নেই যারা প্রতিদিন এমন সব ফতওয়া প্রদান করে থাকে । যার পুরো ফায়দা আমেরিকা, ভারত এবং তাদের মিত্ররা লাভ করে থাকে । সুতরাং এই সব কাজ যখন সর্বসম্মতক্রমে কবিরা গুনাহ, তো এ বিষয়ে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত যে, কবিরা গুনাহকে যে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা দ্বারা নিজের জন্য হালাল ও বৈধ মনে করা কুফরি । এমন কুফরি যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়,বের করে দেয় ।

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার যেই রূপটি দাঁড়ায় তা হল, পুলিশ হোক কিংবা সেনাবাহিনী, তারা যে ডিউটিই দিক না কেন, বিশেষত গণতন্ত্রের শরীয়ত যেই ডিউটিকে জায়েয এবং হালাল (আইন সম্মত) সাব্যস্ত করেছে, সৈনিকরাও সেই ডিউটিকে নিজের জন্য জায়েয এবং হালাল (আইন সম্মত) মনে করে থাকে। ইমারতে ইসলামীয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার সঙ্গী হওয়া, মুসলমানদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে কাফরদেরকে সাহায্য করা, এই সৈনিকেরা নিজেদের জন্য আইন সম্মত বা হালাল মনে করত। এমনিভাবে জামেয়া হাফসা এবং সোয়াতে শরীয়তের আইন প্রবর্তনের দাবিদারদেরকে হত্যা করা, তাদের ধন-সম্পদ লুট করা, তাদের মেয়েদেরকে তুলে নেয়া— এসব সৈনিকেরা নিজেদের জন্য আইনসম্মত বা হালাল মনে করে করেছে । কোনো সৈনিক যদি মুসলমানের রক্তকে এই অপব্যখ্যায় বৈধ মনে করে যে এরা সন্ত্রাস, তবে তাদের এই ব্যখ্যা তাদেরকে কুফরি থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে কোনো পুলিশ বা সৈনিক যদি এসব শরীয়ত পরিপন্থি পদক্ষেপকে হারাম মনে করে, নিজেকে অপরাধী স্বীকার করে এবং হারামকে হালাল সাব্যস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত না হয়, তবে তাকে কাফের বলা যাবে না । বরং তাকে শুধু ফাসেক বলা হবে ।

হ্যাঁ, তাকে এ কথা ভাবতে হবে যে, আমি অনেক বড় কবিরা গুনাহে লিপ্ত, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা আমার উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হবেন! সেই সাথে তাকে এ বিষয়টিও মনে রাখতে হবে যে, অনেক ক্ষেত্রে এই অপরাধগুলো এতই ভয়ঙ্কর যে, এগুলোকে হালাল ও বৈধ মনে না করলেও- শুধু লিপ্ত হওয়াটাই কুফরি। যেমন কাফেরদেরকে খুশি করার জন্য মুসলমানদেরকে হত্যা করার ঘৃণ্য অপরাধ । এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক ।

আলোচনার সার নির্যাস

ইবলিসি এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানদেরকে ফাঁসিয়ে দেয়ার কাজটি সাধারণ |

আসলাফে উম্মত ও কালের মনীষীদের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র

এখন দেখা যাক, গণতন্ত্র সম্পর্কে আসলাফে উম্মত ও কালের মণীষীগণ, যারা আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা, তারা কি বলেছেন । তারা দীন আমাদের চেয়েও অনেক বেশি বুঝেছে এবং দীন সম্পর্কে অনেক বেশি জ্ঞান রাখতেন ।

১. হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থের 'সিয়াসাতুল মদীনা' alba) বলেছেন-

ولما كانت المدينة ذات اجتماع عظيم لا يمكن أن يتفق رأيهم جميعا على

শহর যখন জনবহুল হয়ে পড়বে, তাদের সবার রায় সুন্নাতের হেফাজতের উপর একমত হওয়া সম্ভব নয়... ।

বোঝা গেল, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা, যা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বা পক্ষাবলম্বনের মুখাপেক্ষী, এখানে ইসলাম ও মুসলমানদের সফলতা প্রমাণিত করা ধোঁকবাজি ছাড়া আর কিছু নয় ।

২.হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

ইসলামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কোনো জিনিস নেই। নব্য আবিস্কৃত ও সুবিদিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিছকই প্রতারণা। বিশেষত এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা মুসলমান ও বিধর্মী সদস্যদের দ্বারা গঠিত, সেটা তো অবশ্যই অমুসলিম রাষ্ট্র। [মালফুজাতে থানভী : ২৫২, আহসানুল ফতওয়া : কিতাবুল জিহাদ/সিয়াসতে ইসলামীয়া অধ্যায়]

৩.মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

এরা বলে, এটা নাকি মজদুর ও জনগণের রাষ্ট্র। এটা নিঃসন্দেহে কুফরি রাষ্ট্র।

৪.সাইয়িদ সুলাইমান নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইসলামী গণতন্ত্রের দর্শন প্রত্যাখ্যান করে লেখেন-

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক? ইসলামী খেলাফতের কি সম্পর্ক? (এগুলোর সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই।) প্রচলিত গণতন্ত্র তো সপ্তদশ শতাব্দীর পরে সৃষ্টি হয়েছে। গ্রীকের গণতন্ত্রও বর্তমানের গণতন্ত্রের থেকে ভিন্ন ছিল। সুতরাং ইসলামী গণতন্ত্র একটি অর্থহীন পরিভাষা। আমি ইসলামের কোথাও পশ্চিমা গণতন্ত্র পাইনি। তা ছাড়া ইসলামী গণতন্ত্র বলতে তো কোনো জিনিসই নেই। জানি না মরহুম ইকবাল ইসলামের রূহের ভেতর এই গণতন্ত্র কোথায় দেখতে পেয়েছেন? গণতন্ত্র একটা বিশেষ সভ্যতা ও ইতিহাসের ফল । ইসলামী ইতিহাসে একে খোঁজা অক্ষমতা প্রকাশ ।

৫. হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়িব রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

এটা (গণতন্ত্র) আল্লাহ তায়ালার সিফাতে মিলকিয়াতে শিরক, সিফাতে ইলমেও শিরক। শিরকের পথ অবলম্বন করে কি কেউ ইসালামের শির বুলন্দ করতে পারে? কখনোই না।

৬. হযরত মুফতী রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- এসব ফল ফসল পশ্চিমা গণতন্ত্রের নিকৃষ্ট বৃক্ষের(শাজারায়ে খবিসা) উৎপাদন । ইসলামে এই কুফরি ব্যবস্থার কোনোই অবকাশ নেই। [আহসানুল ফতওয়া : ৬/২৬] ৬. হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী শহীদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের মিল নেই, তায় নয় । বরং গণতন্ত্র ইসলামের একদম বিপরীত বস্তু । [আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল: ৮/১৭৬]

গণতন্ত্রের ভিত্তিই কুফরির উপর

আল্লাহর নিকট হিদায়াত কামনা করে এই আলোচনায় আমরা এ কথা জানার চেষ্টা করব যে, গণতন্ত্র সম্পর্কে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত আমাদেরকে কি ফয়সালা দেয়। যে-ই ব্যক্তি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করে এবং মানে, তার উচিত শরীয়তের ফয়সালাকেই গ্রহণ করা । এই আলোচনায় আমরা শরীয়তে মুতাহহারার দালায়েল ও প্রমাণাদিই শুনব, কোনো ব্যক্তি বিশেষের আমল দেখব না । গণতন্ত্রের পক্ষে কারও নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের কোনো দলিল-প্রমাণ থাকলে, সে যেনো তা পেশ করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গণতন্ত্রের সংজ্ঞার দিক থেকে এতে গণমানুষের বুঝ-বুদ্ধি ও চাওয়া-পাওয়াকে (মানুষের সংখ্যাকে) ওহীর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এজন্য এই গণতন্ত্র সরাসরি কুফরি। গণতন্ত্র কেবল সেটাই, যাতে মানুষের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হয় এবং শাসনের অধিকার মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় । এ ছাড়া কোনো গণতন্ত্রই গণতন্ত্র হতে পারে না ।

মহনামা সানাবিল করচি, মে ২০১৩, সংখ্যা : ১১, পৃষ্ঠা : ২৩-২৪

গণতন্ত্র কি ভিন্ন কোনো ধর্ম ?

সামনে গিয়ে কুরআন, হাদীস এবং ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্য দ্বারা এ কথা প্রমাণ করা হবে যে, গণতন্ত্র ও ইসলাম একটা আরেকটার বিপরীত। না ইসলাম গণতন্ত্রের সাথে থেকে ইসলাম থাকতে পারে, না গণতন্ত্র ইসলামের প্রকৃত রূহের সাথে থেকে গণতন্ত্র থাকতে পারে। সুতরাং গণতন্ত্রের সাথে থেকে একজন মুসলমান কতটুকু মুসলমান থাকতে পারে, তা বোঝা কষ্টকর কিছু নয়। কিছুটা আল্লাহর উপর ঈমান, আর বেশিটা গায়রুল্লাহর উপর ঈমান । অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগতদেরকে পুরোপুরি তাঁরই অনুগত দেখতে চান। কোনো মুসলমান সরিষার দানা পরিমাণও যদি অন্যের হয়, তবে সে সে-ই অন্যেরই হয়ে যায় । আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না । তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালা হওয়ার জন্য জরুরি হল, বান্দা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে-ই ভাবে তার নবী মানবে, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা হুকুম করেছেন, মানতে বলেছেন ।

গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ কুফরি

প্রতিটি মুসলমানের জানা উচিত যে, ইসলাম ইসলামই আর কুফর কুফরই। একটার সাথে আরেকটার সামান্যতম সম্পর্ক নেই । আপনার যদি ঈমান থাকে যে, আল্লাহ তায়ালা এই দীনকে তাঁর প্রিয়তম নবীর উপর মুকাম্মাল করে দিয়েছেন, পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তবে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়ার কোনো আলেমই, হোক সে যত বড়, সে ইসলামকে কুফর আর কুফরকে ইসলাম প্রমাণ করতে পারবে না । আল্লাহ তায়ালা সেই সব ফকীহদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন, যারা তাদের জীবনকে এই দীন বোঝার জন্য কুরবান করে দিয়েছেন । এরপর এই দীনের সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম প্রতিটি বিষয় খুলে খুলে উম্মতকে বুঝিয়েছেন।

ইসলাম কি আর কুফর কি?

গণতন্ত্রের বক্ষে লুকায়িত কুফরি

১. মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও চাওয়া-পাওয়াকে ওহীর উপর প্রাধান্য

দান ।

গণতন্ত্রে মানবজ্ঞানকে ওহীর চেয়েও বেশি মর্যাদা দেয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় ওহী ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণীয় নয়, যতক্ষণ না মানবজ্ঞান (সংসদ সদস্য) তা অনুমোদন না করে । আর ফুকাহায়ে উম্মত এমন কাজকে স্পষ্ট কুফরি বলেছেন। এমনকি গণতন্ত্র আরও এক ধাপ এগিয়ে মানব প্রবৃত্তিকেও ওহীর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে । এটা যে কুফরি, তাতে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে ?

আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধানই ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিবুল আমল হতে পারে না যতক্ষণ না সংসদ সদস্যরা তার অনুমোদন না করেন। এটা নিঃসন্দেহে এমন কুফরি, যা মানুষকে মিল্লাত থেকে খারেজ করে দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বিবাহিত ব্যাভিচারী নারী-পুরুষের শাস্তির বিধান তাঁর কিতাবে তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল করেছেন । আর এই বিধান এই উম্মতের জন্য আইন হিসেবে রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আল্লাহর দেয়া এই বিধান (নাউযুবিল্লাহ) সংসদ সদস্যদের অনুমোদন ছাড়া আমলযোগ্য মনে করা হয় না । বোঝা গেল, এই ব্যবস্থায় কোনো আইন যদি ইসলাম সম্মতও তৈরি করা হয়, তো সেই আইন এজন্য তৈরি করা হয়নি যে যে, এটা আল্লাহর আইন । বরং এই আইন এজন্য মেনে নেয়া হয়েছে যে, মানবজ্ঞান তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কর্মীরা এটাকে উপযুক্ত মনে করেছেন বিধায় এটাকে আইনে পরিণত করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর হুকুমই যদি যথেষ্ট হত, তবে সেটা মানুষের অনুমোদন ও বিল হিসেবে উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ত না। বরং এ প্রক্রিয়া ছাড়াই এই আইন মেনে নেয়া হত, যা আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল করেছেন ।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই ঘৃণ্যকর্মের আলোচনা এভাবে করেছেন যে-

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

(তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমাদের এই অবস্থা (জাহান্নামে চিরদিনের জন্য অবস্থান) তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে

আর যখন তাঁর সাথে শরিক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং (দুনিয়াতে) যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আলাহর' । [সূরা গাফির : ১২]

এই গণতন্ত্রের কুফরিও এটা যে, আল্লাহর শরীয়তকে কেবল আল্লাহর শরীয়ত মনে করে মানা হয় না, গ্রহণ করা হয় না । হ্যাঁ, আল্লাহর সঙ্গে এই পার্লামেন্টকেও যদি অংশীদার বানানো হয়, তখন তারা আল্লাহর শরীয়তকে মেনে নেয় । এখন হক্কানী ওলামায়ে কেরামই বলুন, এই হাকিকত ও বাস্তবতা জানার পরও আল্লাহর শরীয়তকে অনুমোদনের জন্য মানুষের সামনে পেশ করা কেমন?

সেই সাথে এখানে এ বিষয়টিও খুব ভালো করে বুঝে নেয়া উচিত যে, যে-ই পার্লামেন্টে শতভাগ দীনদার ও শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী ব্যক্তিত্বগণ বসেন, কিন্তু ওই পার্লামেন্ট অনুমোদন না দেয়া পর্যন্ত আল্লাহর শরীয়ত আইনে পরিণত হয় না, এমন পার্লামেন্টেরও একই হুকুম ।

কেউ যদি এ কথা বলে যে, আমরা এই প্রক্রিয়া ছাড়াই আল্লাহর শরীয়তকে আইনের অংশ বানিয়ে দেব, তাদের এই বুঝ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা, প্রকৃতি এবং তার
নিয়াম ও ব্যবস্থার প্রকৃত মোতাফেজদের না বোঝারই দলিল । এ ধরনের লোকেরা
তন্ত্র আল্লাহর আইন প্রণয়নের সিফাতকে গায়রুল্লাহর (অর্থাৎ পার্লামেন্ট) কাছে অর্পণ করে
।

এটাই গণতন্ত্রের রূহ বা আত্মা । এতে যদি কেউ এ কথা সংযোজন করে যে, আইন প্রণয়ন কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া উচিত, তবে এটা শুধুই কথার কথা, যা মুখ ফসকে বের হয়েছে । অন্যথায় গণতন্ত্রের রূহ ও আত্মা ওহীর কোনো ধরনের পাবন্দি করা কবুল করে না। এর স্পষ্ট প্রমাণ শরীয়ত পরিপন্থি সে সব আইন যা এই ‘মূর্তি’র মাধ্যমে

করা হয় । পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য যেটাকে হালাল (আইন সম্মত) বলে, সেটা হালাল । চাই সেটা সুদ, ব্যাভিচার এবং মদের মত অভিশপ্ত বস্তুই হোক না কেন? অথবা আল্লাহর 'হুদুদ'ই হোক না কেন? যেগুলো নিশ্চিহ্ন করা তো পরের কথা, সংযোজন বিয়োজন করাও কুফরি। এমনিভাবে পার্লামেন্ট যেটাকে হারাম (বেআইনি) বলে, সেটা হারাম। হোক সেটা জিহাদের মত মহান ইবাদতই হোক না কেন?

এখন এর সম্মান করা, এটাকে পবিত্র মনে করা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রতিটি সংসদ সদস্যের জন্য ফরয। যারা এটাকে হারাম (বেআইনি) বলবে এবং এর বিরোধিতা করবে, তাদেরকে এই আইনের বিদ্রোহী বলা হবে । এখন কেউ যদি এই আইন বাদ দিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইন অনুযায়ী ফয়সালা করতে এবং করাতে চেষ্টা করে, তবে সে এই গণতান্ত্রিক শরীয়তের (জীবনব্যবস্থার) রিটকে চ্যালেঞ্জকারী সাব্যস্ত হবে । আর রাষ্ট্র তাকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে পুলিশ ও সৈনিক থেকে নিয়ে বিমান বাহিনী পর্যন্ত লেলিয়ে দেয়া বৈধ মনে করবে । এমন লোকদেরকে হত্যা করা এবং এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিজেদের জীবন দেয়া সৈনিকদের জন্য ফরয হয়ে যাবে । এজন্য এই ব্যবস্থায় জড়িত ধর্মীয় লোকদের মুখেও আপনি একটা বাক্য অবশ্যই শুনতে পাবেন— 'আমরা আইনের সীমানার ভেতর থেকে শরীয়ত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের তৎপরতা চালিয়ে যাব ।'

হ্যাঁ, আইনের সীমা সেটাই যা গণতন্ত্র প্রণয়ন করেছে। অর্থাৎ কোনো আইনকেই (চাই তা আল্লাহরই আইন হোক না কোনো) ততক্ষণ পর্যন্ত আইন মনে করা হবে না, যতক্ষণ না তা গণতান্ত্রিকভাবে আইনে পরিণত করা না হবে । অর্থাৎ এখানে আল্লাহর 'আমর' (নির্দেশ) নয় বরং মানুষের ‘‘আমর’ চলে!

১.এই পার্লামেন্টে অনুমোদিত জীবন বিধানকে মানুষের জন্য বাস্তাবায়ন করা, মানুষদেরকে এর নিয়মানুবর্তী করা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগ থেকে এর উপর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা এবং এর উপর কাজ করার আকিদা ও চিন্তাধারা লালন করা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের স্পষ্ট অস্বীকার ।

২. গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় মুসলমান ও কাফের উভয়ে সমান । অথচ এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে এবং কুরআনে কারীমের বহু জায়গায় এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমান আর কাফের বরাবর হতে পারে না, সমান হতে পারে না ।

৩.গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট এবং কতিপয় পদাধিকারী ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকেন। আইনের উর্ধ্বে থাকেন। প্রশ্ন হল, আপনাদের আইন যদি ইসলামীই হয়ে থাকে, তো এর অর্থ হয় এটা ইসলাম থেকে বাদ দেয়ার নামান্তর । অর্থাৎ গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার কতিপয় ব্যক্তিকে ইসলামী জীবনব্যবস্থা (শরীয়ত) থেকে উর্ধ্বের সাব্যস্ত করা । এদেরকে এ পরিমাণ পবিত্র জ্ঞান করা হয় যে, ইসলামী আইনও এদের অপরাধের শাস্তি দিতে পারে না! অথচ শরীয়তে মুহাম্মাদীতে তো তার কন্যাও ব্যতিক্রম ছিলেন না। গণতান্ত্রিক এই চিন্তাধারাও ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থি ।

৪.কোনো দেশের আইন যদি শত করা ৯৯ ভাগ ইসলামী হয় আর

পার্লামেন্ট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

যারা সংসদে বসে সেখানে উপস্থাপিত ইসলামী বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং গণতান্ত্রিক পন্থায়ও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে বরদাশত করে না, তাদের কাফের হওয়ার বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ রয়েছে? এটা কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত

শরীয়তের প্রকাশ্য প্রত্যাখ্যান করা নয়? তারা জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে দিচ্ছে না, আবার সংসদেও ইসলামের নাম শুনতে ইচ্ছুক নয় ।

ভাবার বিষয় হল, বিরোধিতার এই 'অধিকার' তাদেরকে দিয়েছে কে? নিঃসন্দেহে এই গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা ও এই পার্লামেন্টই তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে। সুতরাং এমন জীবনব্যবস্থা ও পার্লামেন্ট, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরীয়তের বিরোধিতা করা এবং তা প্রত্যাখ্যান করাকে আইনী অধিকার সাব্যস্ত করে, এর চেয়ে বড় কুফরি ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান আর কী হতে পারে ?

এই ব্যবস্থা কি শরীয়ত বিলের বিরোধিতাকারীদেরকে হেফাজত করে না? অথচ তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে কারও মতানৈক্য থাকা উচিত নয়। তবে তাওবা না করা অবস্থায় তাদেরকে হত্যা করা কি আইন সম্মত (হালাল-বৈধ) হতে পারে? ইসলামী বিল প্রত্যাখ্যানকারীদের সংসদ সদস্য পদ কি অপসরণ করা হয়? তাদের সাথে কি মুরতাদের মত আচরণ করা হয়? কখনোই না । কারণ গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে এরা এখনো সম্মানিত এবং পবিত্র । আর কেউ যদি তাদের সাথে তর্ক করে, তবে রাষ্ট্রীয় মিশনারী তাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করবে ।

আপনারাই লক্ষ্য করুন, যারা আল্লাহর কানুনকে প্রত্যাখ্যান করছে, তাদেরকে কেউ কিছুই বলতে পারে না। গণতন্ত্র তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে । কিন্তু কোনো নাগরিক যদি গণতন্ত্রের আইন মানতে অস্বীকার করে, তবে তাকে দেশদ্রোহী বলা হয়। সংসদ সদস্যরা নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে তাদেরকে হত্যা করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে সেনা অপারেশন চালাতে আইন পাশ করে । এর থেকে বোঝা গেল যে, ‘দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম' ইসলাম নয় বরং ধর্মহীনতা (ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র ।)

গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাও নেই

এই ভ্রান্ত ব্যবস্থা তৈরিকারীরা মানুষদেরকে বিরাট এক ধোঁকা এও দিয়েছে যে, গণতন্ত্রে ইসলামের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে । গণতন্ত্র ইসলামের কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে না। প্রতিটি মুসলমান নামায, রোযা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত ইবাদত করতে পারে। প্রতিটি মুসলমানেরই এই অনুমতি রয়েছে । আর এই স্বাধীনতাকে ইসলামী স্বাধীনতা মনে করে অনেকে হিন্দুস্তানকেও দারুল হরব মানে না । তারা বলেন, হিন্দুস্তানে মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে । এটি শয়তানী ধোঁকা । শব্দের হেরফের করে এক্ষেত্রেও ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন হল, ইসলাম এখন নাউযুবিল্লাহ এতই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে যে, তাকে কুফরি জীবনব্যবস্থা থেকে স্বাধীনতা ভিক্ষা করে বেঁচে থাকতে হবে? আর আমাদেরকে এও দেখতে হবে যে, এই গণতন্ত্র সত্যি সত্যি মুসলমানদেরকে নামায রোযা ইত্যাদির সেই স্বাধীনতা দিয়েছে কি না যা আল্লাহ তায়ালার তার বিশ্বাসীদেরকে দান করেছেন? এই ব্যবস্থার অধীনে সেই আকিদার সাথে নামায আদায় করা হয় কি না, যেই আকিদা লালন করা আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক করেছেন । গণতন্ত্রে নামাযের স্বাধীনতা নেই আমাদেরকে নামায কায়েম' করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধু রুকু-সিজদা করার নামই নামায নয় । বরং নামাযের ফরয়িয়াতের আকিদা রাখা, নামায আদায়ের জন্য 'নিযামে সালাত' বা নামায ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যারা নামায পড়বে না তাদেরকে বাধ্য করা, যারা নামায ত্যাগ করার প্রতি অটল থাকে অথবা এর পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করে, তাদের সাথে কিতাল করা ফরয মনে করা- এসবই নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত এবং জরুরি। অথচ গণতন্ত্রে এর কোনো প্রকার

অনুমতি নেই। শুধু এতটুকু সুযোগ রয়েছে যে, কেউ ইচ্ছা করলে পড়বে। আর যারা পড়বে না, রাষ্ট্র কিংবা কোনো মুসলমান তাকে কিছু বলতে পারবে না।

গণতান্ত্রি ক সংবিধান ও ইসলাম

গণতান্ত্রিক সংবিধান ও ইসলাম গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা মানুষকে এই অধিকার দেয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদের জন্য যে-ই জীবনব্যবস্থা ও সংবিধান পছন্দ করবে, তারা তা গ্রহণ করতে পারবে । এই অধিকার তাদের রয়েছে। তারা যা ইচ্ছা হালাল করবে, যা ইচ্ছা হারাম করবে । যেই দেশ মানুষের এই অধিকার মেনে নিবে, সেটাই আইনী রাষ্ট্র । কোনো রাষ্ট্রে যদি মানুষের এই অধিকার মেনে নেয়, এমন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক আইনী সাংবিধানিক রাষ্ট্র বলার অধিকার রাখে না ।

সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করা সর্বসম্মতক্রমে কুফরি । অথচ এই ব্যবস্থায় আল্লাহর সাথে শুধু সমকক্ষই সাব্যস্ত করা হয় না, বরং আল্লাহর থেকে এই অধিকার- নাউযুবিল্লাহ— পার্লামেন্টকে দেয়া হয় ।

আল্লাহ তায়ালা সংবিধানে তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে স্পষ্ট অপরাধ ঘোষণা করেছেন । এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَا يُشْرِك في حليهِ أَحَدًا

আর তিনি (আল্লাহ তায়ালা) তার হুকুমে (আইনে) কাউকে শরিক করেন না । [সূরা কাহাফ : ২৬]

ইমাম বাগবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

ইবনে আমের এবং ইয়াকুব রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর আরেক কিরাত এর কথা বলেছেন । যার অর্থ, তোমরা আল্লাহর হুকুমে (আইনে) অন্য কাউকে শরিক কর না।”

কারণ এই আইন প্রণয়নের অধিকার কেবল একজনেরই, যিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন । বিশ্বজগতের মহান বাদশা তাঁর সত্য গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন -

تفسير معالم التنزيل المعروف تفسير البغوي : الجزء ٥ للامام محي السنة أبي محمد الحسن بن

الا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ (আইন প্রণয়ন) তাঁরই । [সূরা আ'রাফ: ৫৪]

এই আয়াতের তাফসীরে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত মুফাসসির ও ফকীহ, ইমাম আবু লাইস সমকন্দী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন -

ألا كلمة التنبيه. يعني : اعلموا أن الخلق الله تعالي .وهو الذي خلق الأشياء كلها وأمره نافذ في خلقه

আয়াতের শব্দটি সতর্কতাজ্ঞাপনের জন্য । এর উদ্দেশ্য হল, জেনে রেখো, সৃষ্টিজীব (সৃষ্টি করা) আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট । তিনিই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি পৃথিবী এবং সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছে । আর তাঁর হুকুম ও আইনই এখানে বাস্তবায়িত হবে।

ইমাম নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

আয়াতটি এ কথার দলিল যে, কারো উপর কোনো বিষয় আবশ্যক করা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও অধিকার নেই। [তাফসীরে নিসাবুরী, দ্বিতীয় খণ্ড]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর তাফসীরে এ কথাই বলেছেন । [তাফসীরে রাযী দ্রষ্টব]

আয়াতটি এ কথাই বলছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই । আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা । আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র আইন ও সংবিধান প্রণেতা । সুতরাং কেউ যদি এর যে কোনো একটা গুণ ও বৈশিষ্ট্য অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করে, এর অর্থ হবে সে তার মুখে পাঠ করা কালেমাকে অস্বীকার করছে।

সে ক্ষমতাশালী, সরকারের লোক । অথচ আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে সৃষ্টির মত আইন প্রণয়নকেও তাঁর বিশেষ গুণ বলেছেন ।

আইন তৈরি করা একমাত্র আল্লাহরই অধিকার । পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে নিজের পক্ষ থেকে আইন তৈরি করার এবং কোনো জিনিসের জায়েয-নাজায়েয ও বৈধ বা অবৈধ হওয়ার হুকুম লাগাতে পারে ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ومن زعم أن الله جعل للعباد شيئاً من الأمر فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه. لقوله) : أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ(

আর যে ব্যক্তি এই ধারনা করেছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ‘আল-আমর’ (সংবিধান ও আইন প্রণয়ন) এর সিফাত (গুণ) হতে বান্দার জন্য কিছু অধিকার দিয়েছে, নিঃসন্দেহে সে কুফরি করল, ওই সমস্ত বিষয়ের যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীগণের উপর নাজিল করেছেন । আল্লাহ তায়ালার বাণী এর আলোকে ।

যেই গুণ কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, তা আল্লাহর থেকে নিয়ে মানুষকে দেয়া কিংবা মানুষকে তার সমান সাব্যস্ত করা কি আল্লাহকে অস্বীকার করা নয়? আল্লাহকে এর চেয়ে বেশি অস্বীকার আর কি হতে পারে!

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে জায়েয নাজায়েয ও বৈধ- অবৈধের ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার দেননি । এমনকি কোনো নবীকেও আল্লাহ তায়ালা এই অনুমতি দেননি যে, তিনি আল্লাহর হুকুম ছাড়াই নিজের পক্ষ হতে কোনো বিষয় হালাল বা হারামের ঘোষণা দিবেন । তাহলে একজন সাধারণ মানুষের জন্য এটা কি করে জায়েয হতে পারে যে, সে আল্লাহর আইনের বিপরীত নিজের পক্ষ হতে আইন প্রণয়ন করবে এবং এতে এমন বিষয়কে জায়েয ও বৈধ ঘোষণা করবে যাকে আহাকামূল হাকিমীন কিয়ামত পর্যন্তের জন্য চিরস্থায়ী আইনে (কুরআন) নাজায়ে এবং অবৈধ বলেছেন । অথবা এমন কোনো বিষয়কে নাজায়েয ও অবৈধ ঘোষণা করে পালন করতে বাধ্য করবে, আল্লাহ তায়ালা যা জায়েয এবং বৈধ বলে তা করার নির্দেশ দিয়েছেন ।'

ه جامع البيان في تأويل القرآن المعروف تفسير طبري : الجزء . ١٢ تفسير سورة الأعراف ٤٥. :للامام محمد بن جرير أبي جعفر الطبري ،وتفسير القرأن العظيم المعروف تفسير ابن كثير : الجزء ٣. تفسير سورة الاعراف . للامام أبي الفداء اسماعيل بن عمر بين كثير القرشي الدمشقي

আরব বিশ্বের বিখ্যাত আলেম শায়েখ সফরুল হাওয়ালি 'শরহু আকিদাতুত তাহাবিয়াহ'য় এর ব্যাখ্যায় বলেন-

....وفي هذه الاية دليل على انه لا يجوز لاحد غير الله تبارك وتعالى ان يشرع للناس بأي حال من الاحوال فالشرع المتبع انما هو شرع الله ودينه. لأن الله تعالي هو الذي خلق الخلق. فكيف يكون له الخلق ويكون لغيره الأمر والنهي؟

এই আয়াতে এ কথার দলিল রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কোনো অবস্থাতেই মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করা জায়েয নেই । সুতরাং যেই শরীয়তের আনুগত্য করা উচিত, সেটা হবে আল্লাহ তায়ালার শরীয়ত এবং তার দীন। কারণ আল্লাহ তায়ালাই মখলুককে সৃষ্টি করেছেন। বিধায় এটা কি করে হতে পারে যে, খালেক ও স্রষ্টা হওয়া তো তার জন্যই নির্দিষ্ট, আর আমর ও নাহির (তথা কি করতে হবে,

কি করা

মলুককে সৃষ্টি করেছেন। বিবার করে হতে পারে যে, খালেক ও স্রষ্টা হওয়া তো তার জন্যই নির্দিষ্ট, আর আমর ও নাহির (তথা কি করতে হবে, কি করা

যাবে না, অথবা আইন তৈরি করা) অধিকার থাকবে অন্যের কাছে?

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজে এভাবে বুঝাতে পারেন যে, কোনো ব্যক্তি গাড়ি তৈরি করেছে, গাড়িটি চালানোর পদ্ধতি তো সেই বলবে । এই এই কাজ করতে হবে..., এই এই কাজ করা যাবে না... । গাড়ি চালানোর জন্য এক্সলেরেটার চাপ দিতে হবে এবং থামানোর জন্য ব্রেক ধরতে হবে... । যেই ড্রাইভার গাড়ির আবিস্কারকের কথা না শুনে নিজের ইচ্ছা মত কাজ করবে, তার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? যেখানে ব্রেক করার কথা সেখানে সে এক্সলেরেটার চাপ দিল । গাড়ি সম্মুখে চালানোর সময় রিভার্স গিয়ার লাগাল। গাড়ি ডানে ঘুরানের প্রয়োজন, স্টিয়ারিং বামে ঘুড়ালো...। বলার অপেক্ষা রাখে না এমন ড্রাইভার নিজে তো মরবেই, সাধারণ মানুষকেও মারবে। এজন্য এমন অনাড়ি ড্রাইভারকে শক্তি প্রয়োগ করে গাড়ি থেকে তুলে বাইরে নিক্ষেপ করতে হবে ।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা যখন বিশ্বজগতের স্রষ্টা, তো এই পৃথিবী চালানোর জন্য তাঁর বলে দেয়া পদ্ধতিই চলবে। যাকে জীবনব্যবস্থা, জীবন যাপন পদ্ধতি বা জীবনবিধান বলা

হয়। তাঁর জীবনবিধান ব্যাতীত অন্য কোনো জীবন বিধান চালু করা হলে ধ্বংস অনীবার্য । এই জন্য আল্লাহ তায়ালা এমন অনাড়িদেরকে ড্রাইভিং সিট (মানুষের নেতৃত্ব) থেকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করার জন্য এই উম্মতের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন, আর বলেছেন, এই জিহাদ সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত ।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

আর আলাহ্ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আলাহ বিশ্ববাসীর উপর অনুগ্রহশীল । [সুরা বাকারা : ২৫১]

আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে এই পৃথিবী চালানোর পদ্ধতি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাদের দায়িত্ব হল, তারা এসব অনাড়িদেরকে কিতালের ক্ষমতার মাধ্যমে তুলে নিক্ষেপ করবে। যাতে বিশ্বমানবতা ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে যায়।

শায়েখ সফরুল হাওয়ালি এরপর বলেন-

وهذا ما فعله الناس في الجاهلية الأولي وفي كل جاهلية في كل زمان ومكان. يؤمنون بأن الله له الخلق. ولكن يجعلون لغيره الأمر. فيشرعون ويسنون القوانين ويحلون مايشاءون. ويحرمون ما يشاءون .وهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالي .وهو حقيقة الطاغوت الذي أمر الله تبارك وتعالي أن يكفر به. ولا يكون

الانسان مؤمنا الا اذا كفر بالطاغوت الذي يشرع من دون الله تعالي....

প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগে এমনকি যুগে যুগে প্রতিটি অঞ্চলের জাহেলিয়াতের সময় মানুষ এমন করত যে, স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে তো ঠিকই বিশ্বাস করত কিন্তু জীবন বিধান প্রণয়নের অধিকার অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করত । তারা সংবিধান তৈরি করত, আইন

প্রণয়ন করত । ইচ্ছামত হালাল হারাম নির্ধারণ করত...। এমন কাজ করা শিরকে আকবার, জঘণ্য শিরক । এই গুনাহ আল্লাহ তায়ালা কখনোই ক্ষমা করবেন না ।

আল্লাহর হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করা

মা'বুদে হাকিকী ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজের পক্ষ হতে আল্লাহর হালালকে বেআইনি অর্থাৎ হারাম এবং হারামকে আইন সম্মত অর্থাৎ হালাল ঘোষণা করার অধিকার নেই । এই হক ও অধিকার শুধুই মা'বুদের জন্য নির্দিষ্ট । সুতরাং যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, অথবা কারো জন্য এই হক ও অধিকার স্বীকার করবে, এর অর্থ সে তাকে তার মা'বুদ বানালো, মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করল ।

গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর এই অধিকারে পার্লামেন্টকেও শরিক বানানো হয়। বরং বাস্তবতা হল, শুধু শরিকই বানানো হয় না, আল্লাহর এই অধিকার পরিপূর্ণরূপে পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রকে দিয়ে দেয়া হয় । সুতরাং পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য যদি সুদের মত অভিশাপকে হালাল (আইন সম্মত) ঘোষণা করে, তো গণতন্ত্রের অনুসারীদের জন্য তা 'পবিত্র আইন'-এর অংশ। তাদের আকিদা অনুযায়ী এর সম্মান করা ওয়াজিব ।

এই ঘৃণ্য কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বড় কঠিনভাবে সতর্ক করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক নাযিল করেছেন, অতঃপর তোমরা তার কিছু করে নিয়েছ হারাম ও হালাল' । বল, 'আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর তোমরা মিথ্যা রটাচ্ছ'? [সূরা ইউনুস : ৫৯]

انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا

দেখ, কেমন করে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে । আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই যথেষ্ট । [সূরা নিসা : ৫০]

আল্লাহর বিরোধিতা ও আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেই এরা দীন বলে । আল্লাহকে মিথ্যাপতিপন্ন করাকে ঈমান বলে । আল্লাহ তায়ালা যেই জিহাদকে ফরয করেছেন, এরা সেটাকে সন্ত্রাস ঘোষণা করে হারাম (বেআইনী) বলে ।

হে ঈমানদারগণ! চোখ খুলে একটু দেখো, তোমাদের রবের বিরুদ্ধে কেমন নির্দয়ভাবে মিথ্যাচার করছে এবং তার প্রচার করে বেড়াচ্ছে... ।

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

কেমন বিস্ময়কর কথা! আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও নিজেকে আল্লাহর বন্ধু বলে এবং আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার দাবি করে!

সত্যবাদি হলে প্রমাণ দাও

পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমের ১৫০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

ইসলামের কতিপয় কানুনকে আইনের অংশ বানানো

সাধারণত মুসলিম দেশগুলোর আইনে কিছু ইসলামী ধারা অন্তর্ভুক্ত করে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, এটা ইসলামী আইন । সুতরাং এর আনুগত্য করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরয ।

এ প্রসঙ্গে প্রথমত সেই কথাই স্মরণ রাখতে হবে যা পূর্বে বলা হয়েছে । গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থায় কোনো আইন ততক্ষণ পর্যন্ত আইন হতে পারে না, যতক্ষণ না মানবজ্ঞান অর্থাৎ সংসদ সদস্যরা এটাকে আইন হওয়ার যোগ্য মনে না করে । আর আল্লাহর আইনকে অনুমোদনের জন্য মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া স্পষ্ট কুফরি ।

—শরহু মাআনিল আসার : ২/৮৯, ইমাম আবু জাফর তাহাবী

দ্বিতীয় কথা হল, কোনো আইনে দু'চারটি ইসলামী আইন থাকলেই কি সেটা ইসলামী আইন হওয়ার জন্য যথেষ্ট? কিছু কুফরি আর কিছু ইসলামীর সমষ্টিকে কি ইসলাম বলা যেতে পারে? কখনোই না। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের জায়গায় জায়াগয় বর্ণনা করেছেন । আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? [সূরা বাকারা : ৮৫]

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশ্বাসীদেরকে পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । [সূরা বাকারা : ২০৮] . এখানে ইসলামে পরিপূর্ণরূপে দাখেল হওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে । পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, তোমরা শয়তানের আনুগত্য কর না । এর অর্থ হল, তোমরা যদি পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ না কর, ইসলামের কিছু কথা মানলে আর কিছু কথা ছেড়ে দিলে, তবে এটা শয়তানের আনুগত্য হল । শয়তান এর দ্বারা খুশি হয় । আমেরিকা আজ মুসলমানদের নিকট এটাই দাবি করছে, এটাই চাচ্ছে । তোমরা নামায, রোযা, হজ করে যাও কিন্তু বিচারব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমাদের তৈরিকৃত দীন-ধর্মই অনুসরণযোগ্য হবে। যারা এমন করছে, আমেরিকা তাদের প্রতি খুশি । আর যারা আমেরিকার দীন-ধর্ম মানতে অস্বীকার করে এবং এ কথা বলে যে, আল্লাহর জমিনে কেবল আল্লাহরই দীন চলবে, তাঁর দীন ছাড়া অন্য কোনো দীন ও জীবনব্যবস্থা চলতে পারে না, সাথে সাথে আমেরিকা ও পরকালবিমূখ সমস্ত শক্তি জোট বেধে জ্বলে ওঠে । পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যগুলোর কথা বলা হলে তখনই তারা আনন্দে উৎফুল হয় । [সূরা যুমার : ৪৫]

আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করা

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে । কিন্তু আদালতে যদি কুরআন প্রতিষ্ঠিত না হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য যদি) আন্তর্জাতিক অর্থপ্রতিষ্ঠানগুলোর তৈরিকৃত আইনের অধীনে করা হয়, আর সরকার ব্যবস্থা যদি হয় গণতান্ত্রিক তাহলে আল্লাহর ইবাদত কিভাবে করা সম্ভব ?

অথচ আল্লাহ তায়ালার লক্ষ্য তো এই, জমিনের বুক হতে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও আদর্শ নিশ্চিহ্ন করে আল্লাহর প্রেরিত দীন কায়েম করা । শুধু মুসলমানরাই নয় বরং কাফেররাও সেই দীনের দেয়া ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করবে । যাতে কোনো সামর্থ্যবান ব্যক্তি কোনো দুর্বল ব্যক্তির উপর জুলুম করতে না পারে । মজলুমরা যেন ন্যায়বিচার লাভ করে । গরীবরা যেনো সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার পায় ।

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ শুধু মুসলমানদের সমস্যার ক্ষেত্রেই নয় বরং কাফেরদের সমস্যা ও মামলাতেও (শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় ছাড়া) এই ইলাহী সংবিধান ও আইনের আলোকে সমাধান করা হবে । কিন্তু চিন্তার নীচুতা ও আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশের প্রতি উদাসীনতার অনুমান করুন যে, কাফেরদের মাঝে ফয়সালা করা তো দূরের কথা, মুসলমানদের আদালতে মুসলমানদের ফয়সালাই করা হচ্ছে কাফেরদের আইনে। এ অনুযায়ীই জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে, ফয়সালা প্রয়োগের জন্য পুলিশ ও সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছে । যারা এই কুফরিকে জোরপূর্বক বাস্তবায়ন করে । এর রিটকে সুনিশ্চত

করে । অথচ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনই একমাত্র আইন, যে অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত ।

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না । [সূরা মায়েদা : ৪৮]

এই অধ্যায়ে আমরা গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার একটি মৌলিক স্তম্ভ অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আদালত ও বিচার ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ করব এবং এ উদ্দেশ্যে এই বুনিয়াদি প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করব যে, এসব আদালত ও বিচার ব্যবস্থায় আল্লাহর শরীয়তের স্থলে মানুষের প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী ফয়সালা ও বিচার করার যেই ধারা জারি রয়েছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম কি?

আল্লাহর শরীয়ত ব্যাতীত অন্য কোনো আইনে ফয়সালা করা

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত (কুরআন) দ্বারা ফয়সালা করে না, তারাই কাফের । [সূরা মায়েদা : ৪৪]

আল্লাহ তায়ালা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে তাঁর দীন হেফাজতের জন্য নির্বাচন করেছেন । তাঁর দীনকে কম-বেশি করা থেকে নিরাপদ রাখার তাওফীক দিয়েছেন । কুরআন ও হাদীসকে তার সঠিক অর্থ-মর্মের সাথে বর্ণনা করা এবং তা সালফে সালেহীনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী বোঝার তাওফীক দান করেছেন । যাতে এরা দীনে মুবিন তথা সুস্পষ্ট দীনকে সব ধরনের মিশ্রণ থেকে পবিত্র করেন । কঠোরতা ও সীমলঙ্ঘনের কণ্টকাকীর্ণ পথ থেকে বাঁচিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ রাজপথে চালান।

গণতান্ত্রিক আদালত ও জজ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদালতগুলো শুধু সেই নিয়মের অধীনেই ফয়সালা দেয়াকে আবশ্যক মনে করে, যে নিয়ম এই ব্যবস্থার অধীনে আইনের অংশ সাব্যস্ত হয়েছে । এ ছাড়া অন্য কোনো নিয়ম অনুযায়ী ফয়সালা করাকে হারাম ও বেআইনী মনে করে । এ পরিমাণ হারাম মনে করে যে, তারা এই আইন ছাড়া অন্য আইন (চাই সে আইন আল্লাহরই হোক না কেন) পড়াকেও সময় নষ্ট মনে করে। তাদের কলেজগুলোতে সে সব কুফরি আইনই পড়ানো হয় এবং এর উপরই মামলায় লড়াই করা ও জজ হওয়ার সার্টিফিকেট দেয়া হয় । এর বিপরীতে কেউ আল্লাহর আইনের যত বড় আলেম ও মুফতীই হোক না কোনো, তাকে উকিল ও জজের সার্টিফিকেট দেয়ার যোগ্যই মনে করে না তারা । বরং তারা আলেমদেরকে তুচ্ছ ও মূর্খ মনে করে । এর দ্বারা তাদের আকিদা অনুমান করা আলেমদের জন্য কঠিন হওয়ার কথা নয় যে, তাদের ঈমান কোন আইনের উপর, আল্লাহর আইনের উপর নাকি নিজ হাতে তৈরিকৃত আইনের উপর?

আচ্ছা, কেউ যদি হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে দলিল-প্রমাণ ছাড়াই নিজের জিদের উপর অটল থেকে তাদেরকে প্রথম দলের (কুফরে আকবারে লিপ্ত) অন্তর্ভুক্ত না করে, তবে তাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, সে তাদেরকে দ্বিতীয় দলে কিভাবে গণ্য করতে পারে, যখন নাকি ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কুফরে আসগারের সুরতে এই শর্ত বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনে ফয়সালাকারী এই ইয়াকিন রাখে যে, এমন কাজ করলে তাকে আযাবে নিপতিত হতে হবে' ।

আপনারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে চলমান আদালত ও জজদের অবস্থা একটু লক্ষ্য করুন। তারা কেমন দ্বীধাহীনচিত্তে গায়রুল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করে যাচ্ছে। নিজেদেরকে আযাবের উপযুক্ত মনে করা তো দূরের কথা, নিজেদেরকে

٦احكام القرآن للجصاص : الجزء ٦ . باب الحكم بين أهل الكتاب

বরং ন্যায়পরায়ন, কাযি এবং আল্লাহর ওলি মনে করে। এজন্য একটা হারাম বরং কুফরি কাজকে আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম মনে করা সমস্ত আলেমদের নিকট এমন কুফরি, যা দীন থেকে খারেজ করে দেয়। ইমাম সাহেবের নিকটও এরা দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

হক্কানী আলেমদের নিকট কয়েকটি আবেদন

প্রচলিত সংসদ, আদালত ও এর বিচারকরা কি এই বিশ্বাস (নজরিয়া) রাখে না : সমস্ত মামলায় (বিশেষত সুদ, যেনা, চুরি ইত্যাদি) আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা তাদের উপর ওয়াজিব নয় বরং সেই আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব (আবশ্যক) যা সংসদে মঞ্জুর হয়ে আইনের অংশ হয়েছে? ইমাম সদরুদ্দীন ইবনে আবিল ইজ হানাফী এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুমাল্লাহ ওই সময় কুফরে আকবারের হুকুম বর্ণনা করছেন, যখন বিচারক এই বিশ্বাস রাখে যে, সে ইচ্ছা করলে কুরআনের আইনে ফয়সালা করবে, ইচ্ছা করলে অন্য আইনে, এই স্বাধীনতা তার রয়েছে। আর এখানকার সুরতহাল হল, বিচারকরা অন্য আইনে (কুরআন ব্যতীত গায়রুল্লাহর আইনে) বিচার করাকেই নিজেদের জন্য ফরয করে বসেছে । এমনকি তারা শপথই করে, আমরা সংসদের (গায়রুল্লাহর) পক্ষ হতে অনুমোদিত আইনেই বিচার করব ।

বলুন, প্রচলিত ব্যবস্থা কুরআন দ্বারা ফয়সালা করার গুরুত্ব দেয়? নাকি কুরআনের আইন (প্রস্তারাঘাত, বেত্রাঘাত, হাত কর্তন, কিসাস, সুদের নিষেধাজ্ঞ ইত্যাদি) বাস্তবায়নকে প্রতিহত করে? কুরআনের আইনকে তারা বাস্তবায়নের উপযুক্তই মনে করে না। কুরআন হাদীস এবং ফিকাহর পরিবর্তে তাদের কলেজগুলোতে সেই আইনই পড়ানো হয়, যা ইংরেজরা বানিয়েছে।

বলুন, এই বিচার ব্যবস্থায় কেউ কি নিজেকে গুনাহগার মনে করে?

অনৈসলামী আইন দ্বারা ফয়সালাকারী আদালতকে ইসলামী আইন দ্বারা ফয়সালাকারী আদালত বলে এটাকে (অনৈসলামী আইনকে) ইসলামী সাব্যস্ত করানা?

গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সমান মর্যাদা প্রদান করা

পবিত্র কুরআন এদের সম্পর্কে বলেছে—

الا لسويكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

'যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম' । [সূরা আশ-শুআরা : ৯৮]

এটা জাহান্নামীদের পরস্পরের ঝগড়ার বর্ণনা। জাহান্নামে গিয়ে তারা তাদের নেতাদের সাথে এভাবে ঝগড়া করবে, তর্ক করবে ।

ইমাম ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার তাফসীরে এ কথা বলেন যে-

জাহান্নামীরা তাদের নেতাদের সাথে ঝগড়া করবে এবং বলবে, আমরা তোমাদের নির্দেশ এমনভাবে পালন করেছি, যেভাবে রব্বুল আলামীনের হুকুম পালন করা হয় । আমরা রব্বুল আলামীনের সাথে তোমাদের ইবাদত করেছি । [তাফসীরে ইবনে কাসির]

ইমাম বায়যাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

এই জাহান্নামীরা ইবাদতে তাদের (নেতাদের) হক (অধিকার) সাব্যস্ত করত । [*তাফসীরে বায়যাবী*]

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে তোমাদেরকে (মিথ্যা উপাসকদেরকে) উপাসক বিশ্বাস করে ইবাদত তোমাদেরকে রব্বুল আলামীনের সমান সাব্যস্ত করত । ইমাম ইবনে কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদারিজুস সালিকীনের ২৬০ পৃষ্ঠায় বলেন—

فصل : وأما الشرك فهو نوعان : أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله الا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله وهو

الشرك الذي تضمن تسوية الهة المشركين برب العالمين ...الي ان قال

শিরক দুই প্রকার, শিরকে আকাবর ও শিরকে আসগার ।

শিরকে আকবার, আল্লাহ তায়ালা যা তাওবা করা ছাড়া ক্ষমা করবেন না । যেমন কেউ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে তার শরিক সাব্যস্ত করল। তাকে এমনভাবে ভালোবাসল, যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা হয় । মুশরিকরা যে তাদের প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর বরাবর সাব্যস্ত করত, এই শিরকের প্রাসঙ্গে সেই শিরকও চলে আসে । এ কারণেই জাহান্নামে তারা তাদের মা'বুদদেরকে বলবে-

إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

আল্লাহর কসম! আমরা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলাম। যখন আমরা তোমাদেরকে রব্বুল আলামীনের সমান মর্যাদা দিতাম Iএটা (আল্লাহর সমান বানানো) তাদের এই স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও ছিল যে, আল্লাহ তায়ালা একাই প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই প্রতিটি বস্তুর মালিক এবং প্রতিপালক । তারা এই কথা স্বীকার করত যে তাদের উপাসকরা

কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, কাউকে রিযিক দিতে পারে না, কাউকে মেরে ফেলতে পারে না এবং কাউকে জীবনও দিতে পারে না। তারা যে তাদের মা'বুদ ও উপাসকদেরকে আল্লাহর সমান মর্যাদা দিত, তা শুধুই তাদের প্রতি ভালোবাসা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা থেকে । মুশরিকরা তাদের উপাসকদেরকে আল্লাহর থেকেও অধিক ভালোবাসত । তাদের উপাসকদেরকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করলে হিংস্র বাঘের মত ক্ষেপে উঠত I কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে অবজ্ঞা ও অবমাননা করলে সেভাবে ক্ষীপ্ত হত না । ইমাম ইবনে কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিক এই কিসেমের শিরকে লিপ্ত রয়েছে।

গণতন্ত্র বস্তুত এই শিরকেরই দাওয়াত দেয় । আপনি যদি কোনো সেনা অধিনায়ক বা বিচারপতিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বিশ্বজগতের স্রষ্টা কে? এর মালিক ও কুরআনের আইন ছাড়া অন্য আইনে ফয়সালাকারী আদালতকে ইসলামী প্রমাণ করা

সুতরাং এ আলোচনাটি বোঝার পর আমরা মুসলমান ভাইদের নিকট আবেদন করব, আপনারা প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা- যা শরীয়তের আইন ভিন্ন অন্য আইনে বিচার করে আসছে- এর সম্পর্কে এ কথা বলবেন না যে, আদালতগুলো তো ৭৩ এর আইনে ফয়সালা করে। আর ৭৩ এর আইন ইসলামী। সুতরাং এই আদালতগুলো ইসলামী আইন দ্বারাই ফয়সালা করে । এটা আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার বিরুদ্ধে এত বড় অপবাদ যে, আসমান ভেঙ্গে পড়বে এবং পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে ।

ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আহকামুল কুরআন'-এ এই পয়েন্টটি বর্ণনা করেছেন, যা বর্তমানের মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট। যারা অইসলামী আইনকে ইসলামী প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন এবং অইসলামী

আইনে ফয়সালাকারী আদালত সম্পর্কে বলে যে, এই আদালত ইসলামী আইনে ফয়সালা করে, তিনি বলেন-

فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ جُعُودَ حُكْمِ اللَّهِ أَوْ الْحُكْمَ بِغَيْرِهِ مَعَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ حُكْمُ اللهِ ، فَهَذَا كُفْرُ يُخْرِجُ عَنْ الْمِلَّةِ وَفَاعِلُهُ مُرْتَة... ٌ

আর যদি (এই আয়াতে কুফরি দ্বারা) উদ্দেশ্য আল্লাহর আইন দ্বারা ফয়সালা করার অস্বীকৃতি অথবা কুরআন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করে এ কথা বলা যে, আল্লাহর আইন দ্বারা ফয়সালা করা হয়েছে, এটা (উভয় সুরত) এমন কুফরি, যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয় । যারা এমন করে তারা মুরতাদ ।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

আর (মনে রেখো) যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার না করে শরীয়তপরিপন্থি আইনকে ইচ্ছাকৃতভাবে শরয়ী আইন বলে এবং সে অনুযায়ী বিচার করে) এমন ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে কাফের । [তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, সূরা মায়েদা : মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন-

আর মনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার না করে শরীয়তপরিপন্থি আইনকে ইচ্ছাকৃতভাবে শরয়ী আইন বলে এবং সে অনুযায়ী বিচার করে, এমন ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে কাফের। (তাফসীরে মারেফুল কুরআন : ৩, সূরা মায়েদা]

সুতরাং যারা এসব আদালতকে ইসলামী প্রমাণ করেন, তাদের ভয় করা উচিত ।

ওয়ায়েল,এবং ফুকাহায়ে উম্মত কুরআন ভিন্ন অন্য আইনে ফয়সালা করার বিষয়টি ফুকাহায়ে উম্মত অতি সহজে বুঝিয়ে দিয়েছেন । পাঠকবর্গের সুবিধার্থে সেগুলোও এখানে উল্লেখ করছি।

কুফরে আকবার

১. কুফরে আকবারের সংজ্ঞা তো পূর্বে চলে গিয়েছে, যা ইমাম সদরুদ্দিন ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন । ইহা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি যদি এই দর্শন ও বিশ্বাস লালন করে যে, শরীয়তের আইন অনুযায়ী এই যুগে চোরের হাত কাটা, যেনাকারীকে প্রস্তারাঘাত করা কিংবা বেত্রাঘাত করা, কুরআন- সুন্নাহর ভিত্তিতে বৈশ্বি সম্পর্ক বজায় রাখা, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ করা.... উপযোগী নয়, এগুলো প্রয়োগযোগ্য নয় । অথবা এগুলো বাস্তবায়ন করাকে লজ্জা, অপমান এবং (বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্বে) মানহনিকর মনে করে। অথবা 'হুদুদুল্লাহ'তে সংযোজন করাকে বৈধ মনে করে, অথবা সংযোজন করে নেয়,

অথবা এমন বিশ্বাস গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে থেকে একনিষ্ঠভাবে শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করা

যদি এ কথা বলা হয় যে, যারা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী নিযাম ও জীবনব্যবস্থার জন্য তৎপর, তারা তো মুখলিস । এজন্য কি তারা প্রতিদান পাবে ? এমন মনে করা নফসের ধোঁকা এবং শয়তানী অপকর্মকে তাদের সামনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে উপস্থাপন করা । যে কোনো কাজ যা ভালো উদ্দেশ্যে ইখলাস এবং বিশুদ্ধ নিয়তে করা হয়, আল্লাহর কাছে তা কবুল হয় । তাহলে কাফেরদের মূর্তি পূজার আমলকে কুফরি বলা হয়েছে কেনো? তারা

তাদের ধারনা অনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তেই এসব মূর্তির পূজা করত । তারা বলত মূর্তিগুলো আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সুপারিশক রে । [৯৮ *সূরা* ইউনুস: ১৮]

তারা আরো বলত এটা আমরা তো কেবল এইমূর্তিগুলো এজন্য পূজা করি যে, এ মূর্তিগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বানিয়ে দিবে। [সূরা যুমার : ৯২]

এরা তো এ মূর্তিগুলোকে এ কারণেই পূজা করত যে, এরা মূর্তিগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলকে কুফর বলেছেন।

একটা বিষয় খুব ভালো করে বুঝে নিবেন যে, কোনো আমলকে ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম আমল বা নেক কাজ বলা যায় না, যতক্ষণ না তার ভেতর দুটি জিনিস পাওয়া না যায় । এক. আমলটি আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে হতে হবে। দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের তরিকা অনুযায়ী হতে হবে । এই জিনিস দুটি কারো আমলের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তার সেই আমল উত্তম আমল বা নেক কাজ বিবেচিত হবে।

ফুযাইল বিন ইয়ায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

العمل الحسن هو أخلصه ، وأصوبه . قالوا : يا أبا علي ! ما أخلصه . وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل ؛ حتى يكون خالصا صوابا . والخالص ما كان لله ، والصواب ما كان على السنة.

নেক আমল হল যা ইখলসওয়ালা হয় এবং সঠিক হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আবু আলী! ইখলাসওয়ালা এবং সঠিক আমল কোনটি? (ফুযাইল বিন ইয়ায রহমাতুল্লাহি

আলাইহি) বললেন, নিঃসন্দেহে আমল যদি খালেস হয় কিন্তু সঠিক না হয়, তা কবুল করা হয় না। আর যখন সঠিক হয় কিন্তু খালেস হয় না, সেটাও কবুল করা হয় না । খালেস আমল হল সেটা, যা শুধু আল্লাহর জন্য হয় । আর সঠিক আমল হল সেটা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী হয় ।

প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

কোনো ব্যক্তি এমন আমল করল, যে ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই, তা কবুল করা হবে না

আর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

গণতন্ত্রের পতাকা উত্তোলন করা হরাম

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

যে ব্যক্তি মুখ থুবড়ে পড়া পতাকার (অর্থাৎ যার হাকিকতই মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়) অধীনে কিতাল করল, কোনো গোঁড়ামির কারণে ক্রোধান্বিত হল অথবা কোনো সাম্প্রদায়িকতার দিকে মানুষকে আহ্বান করল অথবা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে কাউকে সাহায্য করল এবং ত্রে কাজগুলো করতে গিয়ে) মারা গেল, তার মৃত্যু হল জাহেলিয়াতের মৃত্যু

٦الصحيح المسلم : الجزء ٩ . كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل
حال وتحريم الخروج علي الطاعة ومفارقة الجماعة

দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া'য় ৭৪৫১ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, (প্রশ্নটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত) :

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকা ছিল ইসলামকে বুলন্দ করার জন্য এবং কুফরকে পরাজিত করার জন্য। আপনার নির্বাচনেও কি এটাই উদ্দেশ্য? এসব দলগুলোর পারস্পারিরক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ইসলাম ও কুফরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতই? তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পতাকাকে ইসলামী পতাকা এবং অন্যের পতাকাকে কুফরি পতাকা সাব্যস্ত করবে? (আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পানাহ দিন।) আর প্রচলিত এই নির্বাচন কি ইসলামী শিক্ষা ও দিকনির্দেশান অনুযায়ী হচ্ছে? এখানে কি ইসলামী আহকাম ও এবং শরয়ী হুদুদের পক্ষপাতিত্ব (রেআয়াত) করা হচ্ছে? পরস্পরের বিরুদ্ধে লাঞ্ছনা, অবমাননা, মিথ্যা, পরনিন্দা, উপহাস, অপবাদ আরোপ... এমন কোনো ঘৃণ্য অস্ত্র নেই, যা ব্যবহার করা হয় না । অনেক সময় তাকফীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপরও ইসলামী পতাকার অধীনে এগুলো করা এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ পতাকাকে ইসলামী পতাকা বলা অত্যন্ত দোষণীয় এবং ইসলামকে কলঙ্কিত করা ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কুফরি কিন্তু এর সাথে জড়িত সবাই কাফের নয় এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র দীন ও জীবনব্যবস্থা । এটা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে স্পষ্ট অস্বীকার করা । কিন্তু এর থেকে এই উদ্দেশ্য নেয়া কখনোই সঠিক হবে না যে, যে ব্যক্তিই এর সাথে জড়িত থাকবে, তাকেই চোখ বন্ধ করে কাফের ফতওয়া দেয়া হবে । কারণ কোনো ব্যক্তির কথা ও কাজ কুফরি হওয়া এক বিষয় আর ওই কথা ও

কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে খোদ ওই ব্যক্তিকে কাফের সাব্যস্ত করা আরেক বিষয় । এই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য না রাখার কারণে এবং ব্যক্তির উপর কুফরির হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে অসাবধনতা থেকে অতিরিঞ্জনের (গুলু) জন্ম নেয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে এই উম্মতের ধ্বংসের কারণ বলেছেন । হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লঅহজু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلو في الدين

হে লোক সকল! সাবধান! দীনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচো । কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে দীনের

'মাউসুআতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহেব আল-মুআসেরা' গ্রন্থ (২/১০৬৬) তে এসেছে-

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি: এটি এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যাতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের নির্বাচনে গঠিত পরিষদের মাধ্যমে জনগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায় শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে। সে প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. ভোট দেওয়ার অধিকার: জনগণের কতিপয় ব্যক্তিবর্গ কোন একটি আইনের বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বিল উত্থাপন করে। এরপর পার্লামেন্ট কমিটি সেটার উপর আলোচনা করে ও ভোট দেয়।

২. গণভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন পার্লামেন্টের অনুমোদনের পর জনগণের রায় প্রকাশ করার জন্য পেশ করা।

৩. না-ভোট দেওয়ার অধিকার: কোন একটি আইন প্রকাশ করার নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক লোকের পক্ষ থেকে এ আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর অধিকার। যাতে করে এ আপত্তির ফলে গণভোটের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। যদি হ্যাঁ-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে আইনটি কার্যকর করা হয়। আর যদি না-এর পক্ষে বেশি ভোট পড়ে তাহলে সেটি বাতিল করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল সংবিধান এ নিয়মে চলছে। কোন সন্দেহ নেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহর আনুগত্য ও আইনপ্রণয়ন অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নব্য শিরকের স্বরূপমাত্র। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর আইন প্রণয়ন করার একক অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং মাখলুককে এ অধিকার প্রদান করা হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কিছু নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার অধিকার নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"।[সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৫৭]

গণতন্ত্রের মূলনীতি

গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো পাঁচটি :

১. নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ নাগরিকের সমর্থন যারা পায় তাদেরই সরকারী ক্ষমতা হাতে নেবার অধিকার রয়েছে।

২. এ নির্বাচন যাতে নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হতে পারে এর বাস্তব ব্যবস্থা হওয়া অপরিহার্য । নিরপেক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারই আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশ পরিচালনা করতে পারে। বিরোধী দলও এমন সরকারের বৈধতা ও নৈতিক অবস্থানের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় ।

৩. সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে সরকারের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দান করার জন্য জনগণের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে। দেশের আইন-শৃঙ্খলার সীমার মধ্যে থেকে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের সুযোগ থাকা গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ ।

৪. জনগণের মতামত ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করা গণতান্ত্রিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

৫. সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালনার ব্যাপারে মৌলিক নীতিমালা শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ হতে হবে। শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোন নিয়মে সরকার গঠন, পরিবর্তন ও পরিচালিত হলে তা অবৈধ বিবেচিত হবে। ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে গণতন্ত্রের উপরোক্ত পাঁচটি মূলনীতির কোন বিরোধ নেই। জনগণের উপর শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন

অনুমতি ইসলামে নেই। রসূল (সাঃ)-এর পর যে চারজন রাষ্ট্রনায়ক খোলাফায়ে রাশিদীন হিসাবে বিখ্যাত তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেননি । জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহেই তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের নির্বাচনের পদ্ধতি একই রকম ছিলো না কিন্তু তাঁরা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিতই ছিলেন। তাঁরা কেউ এ পদের প্রার্থী ছিলেন না । আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী পদের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পদের অযোগ্য মনে

করতে হবে।

এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ)-এর পর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সাহাবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য নন। কারণ তিনি চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন। অথচ হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রঃ) সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য বলে বিবেচিত। এর কারণ এটাই যে, রাজবংশের রীতি অনুযায়ী তাঁর পূর্ববর্তী শাসক তাকে মনোনীত করার পর ঐ পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হওয়া ইসলাম সম্মত নয় বলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জনগণ তারই উপর আস্থা স্থাপন করায় তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন ।

ইসলামে শাসন ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব এলে পালানোরও অনুমতি নেই। এ নীতি গণতন্ত্রের আধুনিক প্রচলিত পদ্ধতির চেয়েও কত উন্নত!

ইসলামে সরকারের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগণের পবিত্র দায়িত্ব । নামাযে পর্যন্ত ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির উপর লুকমা (ভুল ধরিয়ে দেয়া) দেয়া ওয়াজিব। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হলো রসূলের প্রতিনিধি। নামাযের ইমাম যেমন রসূলের প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল করলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব মুক্তাদিদেরকে পালন করতে হয়,

তেমনি রসূল (সাঃ) যে নিয়মে শাসন করতেন এর ব্যতিক্রম হতে দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগণের কর্তব্য। এসব দিক বিবেচনা করলে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতি ও ইসলামের সাথে শুধু মিলই নয়, ইসলামের নীতি গণতন্ত্রের চাইতেও অনেক উন্নত ও ত্রুটি মুক্ত।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারণা

প্রচলিত গণতন্ত্র পাশ্চাত্য থেকেই আমদানি হয়েছে। ঐ গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার সর্বোচ্চ শক্তি। আইনের সর্বজনীন সংজ্ঞা হলো "Law is the will of the sovereign" (সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছাই আইন)। আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় জনগণই সার্বভৌম সত্তা। তাই জনগণ ও জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট যে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী । অবশ্য পার্লামেন্ট জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্র মেনে

চলতে বাধ্য। তবে পার্লামেন্ট দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাসনতন্ত্রও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। নির্বাচিত পার্লামেন্টই বাস্তবে জনগণের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। শাসনতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই পার্লামেন্টের ক্ষমতা খর্ব করতে পারে না ।

পাশ্চাত্য বলতে আমেরিকা ও ইউরোপকেই বুঝায়। সেখানে ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও তারা জড়বাদে (বস্তুবাদ) বিশ্বাসী। তাদের সভ্যতার ভিত্তিই হলো জড়বাদ। এ মতবাদের সার কথা হলো : বস্তুর উর্ধে অতীন্দ্রিয় কোন সত্তায় বিশ্বাস করা জরুরী নয়। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। Divine Guidance

(আল্লাহর হেদায়াত) এর কোন প্রয়োজন নেই । ধর্মীয় ব্যাপারে যার যার ধর্ম বিশ্বাসে সবাই স্বাধীন । কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামষ্টিক জীবনে ধর্মকে টেনে আনা অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় ।

যদিও মানুষ নৈতিক জীব এবং ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সর্বজনীন ধারণা ও চেতনা সবাই স্বীকার করে, তবুও অধিকাংশ মানুষ একমত হয়ে এ সবের বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী বলে তারা মনে করে ।

এ নীতির ভিত্তিতেই পাশ্চাত্যের সব দেশের আইনেই পরস্পর সম্মতি থাকলে বিয়ে ছাড়াও নারী ও পুরুষের যৌন মিলন দোষণীয় নয়। এমন কি কয়েকটি দেশের আইনে সমকামিতাও বৈধ। অথচ পশুদের মধ্যেও সমকামিতা নেই

এ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে Divine Guidance-কে অস্বীকার করে শুধু জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হতে পারে । কোন পশুর মধ্যেই সমকামিতার মতো অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায় না। অথচ শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে তা আইনত বৈধ বলেও স্বীকৃতি পায়!

বিস্ময়ের বিষয় যে পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু সামষ্টিক জীবনে স্রষ্টার নির্দেশ মানা প্রয়োজন মনে করে না। তারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। আবার তারা ধর্মেও বিশ্বাসী। কিন্তু ধর্মকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন মনে করে ।

ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে । ইসলামে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌমত্বের অধিকারী । সার্বভৌমত্ব মানে আইন রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা। আইন সার্বভৌম শক্তিরই ইচ্ছা ও মতামত । পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণ বা তাদের নির্বাচিত আইনসভাই সকল ক্ষেত্রে আইন-দাতা । আইনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা তাদেরই হাতে । ইসলামে আল্লাহর দেওয়া আইন ও বিধানের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত নেবার বৈধ অধিকার জনগণের বা পার্লামেন্টের নেই। ইসলাম ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের এ মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে আইনের নিরপেক্ষ শাসন একমাত্র আল্লাহর আইনের অধীনেই চালু হওয়া সম্ভব । মানব রচিত আইনের এমন নৈতিক মর্যাদা সৃষ্টি হতে পারে না যা পালন করার জন্য মানস ভালব থেকে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। মানুষের তৈরি

ইসলামী শাসন ও মুসলিম শাসন

প্রকৃত কথা এটাই যে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর একমাত্র হযরত ওমর বিন আবদুল আযীযের শাসনকাল ছাড়া অবশিষ্ট শাসনকালকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসন বলা যায় না। ঐ সব শাসনকে মুসলিম শাসনই বলা উচিত। কারণ মুসলমানরা যা করে তাই ইসলাম নয়। ইসলাম যা করতে বলে তা করা হলেই ইসলামী কাজ বলে গণ্য হয় ।

রসূল (সাঃ) কে স্বয়ং আল্লাহ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছেন । তাই তাঁর ব্যাপারে নির্বাচনের কোন প্রশ্নই উঠে না। তাঁর পরে কে সরকারী .ক্ষমতার অধিকারী হবেন সে বিষয়ে তিনি কোন নির্দেশ দিয়ে যাননি । মদীনার আনসার ও মুহাজিরগণ হযরত আবু বকর (রাঃ) কে আমীরুল মুমিনীন নির্বাচিত করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তার ইন্তিকালের পূর্বে মদীনাবাসীকে সমবেত করে হযরত ওমরকে এ দায়িত্ব দেবার প্রস্তাব দিলে সবাই তা সমর্থন করেন । হযরত ওমর (রাঃ) তার ইন্তিকালের পূর্বে ৬ জন বিশিষ্ট সাহাবীর এক প্যানেল গঠন করেন। প্যানেলের অন্যতম সদস্য হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) বাকী ৫ জনের ব্যাপারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে ঘরে ঘরে যেয়ে জনমত সংগ্রহ করেন । অধিকাংশ মদীনাবাসী হযরত ওসমানের (রাঃ) পক্ষে রায় দেন। হযরত ওসমান (রাঃ) নিহত হবার পর মদীনাবাসীরা হযরত আলী (রাঃ)-কে এ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য দাবী জানান। রসূল (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর যেভাবে মদীনাবাসীরা হযরত আবু বকরের (রাঃ) হাতে বাইয়াত হন তেমনিভাবে তারা হযরত আলীর (রাঃ) নিকট বাইয়াত হন। হযরত আলী (রাঃ) নিজের উদ্যোগে খলীফা হননি ।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে প্রথম ৪ খলীফা নিজেরা চেষ্টা করে ক্ষমতা দখল করেননি। তারা একই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হননি, কিন্তু অবশ্যই তারা নির্বাচিত হয়েছেন। এ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে ইসলাম নির্বাচনের নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করেনি। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে নিজেদের উপযোগী নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। পদ্ধতি যে রকমই হোক একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন হতে হবে-এটাই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ। সাহাবাগণের যুগেই এ নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় ।

তাবেয়ীগণের যুগে খলীফা সুলাইমান মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করে খামে বন্ধ করে রেখে নির্দেশ দেন যে তার মৃত্যুর পর সকল গণ্যমান্য নাগরিকদেরকে সমবেত করে ঐ খাম খুলতে হবে। যাকে খলীফা নিয়োগ করা হলো সবাই তাঁর নিকট বাইয়াত হবে। এ নির্দেশ অনুযায়ী সমাবেশে খামটি খুলে যখন পড়া হলো তখন জানা গেল যে খলীফা সুলাইমান তাঁর ছেলেকে বাদ দিয়ে গমাতা ওমর বিন আবদুল আযীযকে নিয়োগ করেছেন ।

নেতৃস্থানীয় লোকেরা নবনিযুক্ত খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতে (বাইয়াত হতে) এগিয়ে আসার আগেই ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, “যে পদ্ধতিতে আমাকে খলীফা নিয়োগ করা হয়েছে তা ইসলামী পদ্ধতি মনে করি না। তাই আমি আপনাদের বাইয়াত গ্রহ প্রস্তুত নই। কাকে খলীফার দায়িত্ব দেয়া হবে এ বিষয়ে ফায়সাল, ইখতিয়ার আপনাদের। আপনারা স্বাধীনভাবে আপনাদের খলীফা নির্বাচিত করবেন \

উপসংহার

ইসলামকে বিদেশী মাপকাঠিতে ব্যাখ্যা দান চিরদিনের জন্য বন্ধ করতে হবে। ইসলামকে তার নিজ জায়গা থেকে দেখতে হবে ও দেখাতে হবে। ইসলামের স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তা বজায় রেখেই আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক পন্থায় যৌক্তিকভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করা সম্ভব। মানব রচিত কোন মতবাদ বা বস্তুবাদী আদর্শের ছত্রছায়ায় ইসলামকে বর্তমান যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা আত্মঘাতী। কোন মানুষই যেমন এক সঙ্গে দুই প্রভুর গোলামী করতে পারে না, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী দু'টি আদর্শের অনুসরণ একজন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব।

মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- তাদের ধর্মকে নিয়ে গৌরববোধ করা, তাদের রবের পক্ষ থেকে দেয়া বিধানের প্রতি আস্থা রাখা; এ বিধান তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে যথেষ্ট এবং আল্লাহর শরিয়ত বিরোধী সকল তন্ত্র-মন্ত্র থেকে নিজের মুক্ততা ঘোষণা করা।

শাসক ও শাসিত সকল মুসলমানের কর্তব্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র বা জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী হিসেবে গ্রহণ করার দাবী হচ্ছে- প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর শরিয়তকে সম্মান করা, নবীর আদর্শের অনুসরণ করা।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন I